প্রসঙ্গ : যোগাযোগ

মনোজ চাকলাদার

'যোগাযোগ' বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে বেরুতে থাকে। শুরু অশ্বিন ১৩৩৪-এ এবং শেষ হয় চৈত্র ১৩৩৫-এ। প্রায় ঊনিশ মাস ধরে উপন্যাসটি বেরয়। প্রথম দুটি সংখ্যা বেরুবার পর রবীন্দ্রনাথ 'তিন পুরুষ' নামটি বদলে করেন 'যোগাযোগ'। 'তিন পুরুষ' নামটি রবীন্দ্রনাথের ঠিক পছন্দ হয়নি, সম্পাদকেরও নয়। শেষপর্যন্ত 'তিন পুরুষ' বদলে হয় 'যোগাযোগ'। এ নিয়ে অবশ্য একটি মাঝারি গোছের কৈফিয়ত দিয়েছেন লেখক। সম্পূর্ণ কৈফিয়ত এ লেখার জন্য প্রয়োজন নেই। ''সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্য রচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক।'' —হ্যাঁ নামকরণটি রবীন্দ্রনাথকে বড়ো দ্বিধাদ্বন্দ্বেতে ফেলে। সম্পাদক মত প্রকাশ করে সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সেক্ষেত্রে মত। 'রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর নাম দিই সংজ্ঞা। গল্প জিনিসটাও রূপ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তো বলি গল্পের এখন নাম দেওয়া উচিত নয়, যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট।'' তিনি এও মনে করেন নামকরণে কোন ব্যাখ্যার তাগিদ নেই। ''সেটা এতই নির্বিশেষ যে গল্পমাত্রেই খাটতে পারে। সরকারি জিনিস মাত্রেরই মতো সে চমৎকারিতা নেই। নাই-বা রইল। জাপানে দেখেছি, তলোয়ারের ফলকটার উপরে কারিগর যখন তার কারুকলার আনন্দ ঢেলে দেয় খাপটাকে তখন নিতান্ত সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকিব গিরি করতে না পাঠায়

'' 'তিন পুরুষ', নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল 'যোগাযোগ' '' (৪ অক্টোবর ১৯২৭। 'কিন্তু জাহাজ। শামের পথ)

উপন্যাসটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সাহিত্যকালের মধ্যগগনে। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। লেখা হয়েছে বেশ কিছু বিখ্যাত রচনা। ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি। সম্মান অসম্মান নিয়ে চুলচেরা বিচার পর্ব চলেছে। আধুনিক কালের অনুশোভার আগমনবার্তা। সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন। আমাদের দেশে ব্রিটিশদের জৌলুসময় জীবন যাপন। নারীদের সামনে খুলে যাচ্ছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিচ্ছুরণ। এত বিকিরণে রবীন্দ্রনাথ কখনও বলতে পারেন, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, পরের মুহূর্তে বলতে হয় আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে, আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে, দুঃখ বিপদ তুচ্ছ - করা কঠিন কাজে।

প্রথম পাতা থেকে শেষপাতা পর্যন্ত গদ্য বিন্যাসের অপূর্ব অ-দৃশ্য অশ্রুত কৌশল। এত শোভাময়তা প্রলোভন এড়িয়ে দ্রুত আখ্যান পাঠে যাওয়া মানে উপন্যাসের মর্মবস্তুকে উপেক্ষা করা যায় আমার পূর্বে দুবার পাঠে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। এবারও যে সার্থক সফল হয়েছি একথা বলতে পারি না।

ঐতিহাসিক দিক, বিশেষত জমিদার সমাজের বিবর্তন, ভারতীয় নারীর মান অবমাননা যা শাশ্বতভাবে চলে আসছে, মীরাবাঈয়ের নারীর দর্শন এবং ইউরোপের শিক্ষার - আলোকে নারীর সম্মান ও অধিকারবোধ সম্পর্কে ওয়াকিবহালতা এত নিবিড়ভাবে সম্মিলন ঘটিয়েছেন উপন্যাসকার তা বিমোহিত হয়ে মান্যতার কাছে আশ্রিত হতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চরিত্রদের ব্যবহার্য জিনিশের উল্লেখ এবং আলো আঁধারিত পরিবেশ মণ্ডল রচনা বাংলাসাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এতো বড়ো সম্পদ ফেলে কেন বিদেশে ছুটি! রবীন্দ্রনাথ নকসি কাঁথা বুননের মতো প্রথম থেকে শেষপাতা পর্যন্ত আমাদের পাঠকে নিয়ে গেছেন।

'যোগাযোগ' লেখার আগে ইউরোপ জুড়ে ফ্রয়েডের তত্ত্ব বেশ আলোচিত এবং আলোড়ন তুলেছে। এ ছাড়া হেনরিক ইবসেনের নারীবাদও বেশ ঝড় তুলেছে। এর আগেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বত্রিশ বছরের এলিজাবেধ ক্যাডি স্ট্যানটন এক চার্চ বা উপাসনালয়ে নারীর অধিকার নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এতে বলা হয় নারী সম্পর্কে ভুলবিচার, নারী মূল্যায়ন এতকাল ভুল হয়ে এসেছে। এর আন্দোলন ১৯০২ পর্যন্ত টেনে আনেন স্ট্যানটন, অপরদিকের তাঁর সহকারী সুসান বি.এন্তনিও বিশেষ ভূমিকা নেন। ১৯০৬ -এ তাঁর মৃত্যুর পর নারী আন্দোলন কিছুটা থিতিয়ে যায়। এইসব প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকবে। কারণ তিনি ইউরোপের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি ছিলেন। একথা মনে রাখা দরকার ইউরোপের সমাজ জীবন এবং বাংলা ও বাঙালির সমাজজীবন সম্পূর্ণ আলাদা। তফাৎও ব্যাপক। এছাড়া বাংলাদেশ তথা ভারতের ঔপনিবেশিকবাদের চাল চলনও বিচিত্র। ফলত তাকে আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত এবং মীরাবাঈয়ের জীবনবোধ তাঁর নায়িকা কুমু বা কুমুদিনীর অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে স্থান করতে হয়েছে। অপর দিকে কুমুর দাদার ভিতর পাশ্চাত্য

নারীবোধ ও নারীর সম্মানবোধকে স্থাপন করতে হয়েছে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নারী - শিক্ষা, নারীর সম্মানবোধ ও নারীর অস্তিত্ব - দ্বন্দ্ব ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ঘটেছে বাংলাদেশের জমিদারদের সামন্তবোধ। এই সামন্তবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সংস্থাপন এবং নারীর মর্যাদার স্তর। সমস্যা ও সমস্যার উত্তরণ কীভাবে ভেবেছেন বা কোন পর্যায় নিয়ে যাওয়া সাহিত্যের বাস্তবতাকে তাই নিগূঢ় প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন। আশি বছর পেরিয়েও এখন প্রাসঙ্গিক, শুধু জমিদার পশ্চাৎপটটি সরিয়ে দিলে। হয়তো বা বাঙালির কাছে এক ক্লাসিক হয়ে উঠেছে। আবার একথা সত্য ইউরোপের সাহিত্যের পাশে এ জোলো ঠেকতে পারে তা ঐতিহাসিক কারণে এবং নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশে। এর আগে উল্লেখ করেছি ইউরোপের ইতিহাসবোধ ও বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসবোধের তফাৎ অনেক এবং এমনকী আধুনিকবোধেরও তফাৎ। বহু সময় আমাদের ক্লাসিক বোধ এবং ইউরোপের ক্লাসিকবোধ এক নাও হতে পারে। এতৎ সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে এ এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে দ্বিধাও নেই ক্লাসিক বলতেও দ্বিধা নেই, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ বাংলা সাহিত্যে বিরল। একমাত্র জীবনানন্দের সাহিত্যে এই সাহিত্যবোধের প্রতিফলন দেখতে পাই। যেমন 'মরবিড' হিশেবে প্রতিস্থাপিত ('কল্যাণী' উপন্যাসটি স্মরণ রেখে)।

এই উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর লিখনশৈলী (diction)। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রায় সব উপন্যাসেরই লিখনশৈলী এরকম ছিল না। চোখের বালি, চার অধ্যায়, ঘরে - বাইরে, গোরা-প্রতিটি উপন্যাসেই আলাদা লিখনশৈলী। 'যোগাযোগ'ও বটে।

যোগাযোগ-এ যে কোন ছোট ছোট ঘটনার ফলে চরিত্রের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে লেখক বলেছেন তা অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে। ফলে প্রতিটি চরিত্রের সত্তা ও অস্তিত্ববোধ অতি স্পষ্ট। জমিদারী ব্যবস্থা, প্রাচীন ও নবীন প্রজন্মের মূল্যবোধ তুলে ধরেছেন বিপ্রদাস ও মধুসূদন - এর আচার আচরণ এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে। এরই পাশাপাশি নারীর মূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন এবং নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা। নারী কীভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার পরাজয় অথবা জয়কে গ্রহণ করবে। অবমান ও অবমাননা নিয়ে এই উপন্যাস গাঁথা।

।।দুই।।

আটান্নটি (৫৮) পরিচ্ছেদে উপন্যাসের বিস্তার। রয়েছে দুটি ররিবারের অর্থাৎ এক্ষেত্রে জমিদার বংশের দ্বন্দ্ব। চাটুজ্যেদের সঙ্গে ঘোষালদের, এর একটু ইতিহাস রয়েছে। ক্রমশ ক্ষীয়মান ঘোষাল পরিবার, অপরদিকে দাপট নিয়ে, চাটুজ্যে জমিদার। ঘোষালরা চাটুজ্যেদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে না পেরে দ্বিতীয় বার ভিটে ছাড়তে হয়। ''যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায়, তারা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে খসে পড়ে বলেই লাঠি তারা মনে মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চলে আসছে।'' —এ এক দিকের লড়াই। এ হল পুরুষে পুরুষে লড়াই, এও এক রাজনৈতিক লড়াই। তা যে কখনও' এথিকস' বা নীতি মেনে চলবে এ নিশ্চয়তা কে দেবে। এ দ্বন্দ্ব তো এখনও। যদিও এই উপন্যাসে অঞ্চল বনাম অঞ্চলের লড়াই। জমিদার ও জমিদারের প্রজাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের লড়াই। এ লড়াই সর্বজনবিদিত। বহিঃপ্রাঙ্গনের লড়াই। অপর লড়াইটি সূক্ষ্মতর অভিমানভরা লড়াই। তা নারী-পুরুষের লড়াই। যৌন আড়ম্বরে পূর্ণ নকল পৌরুষ বনাম নারীর মর্যাদার ও অধিকারের লড়াই।

''পুরোনো ধনী- ঘরে পুরাতন কাল যে দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছোতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়। বিপ্রদাসের বাবা মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেনি।'' বনেদিয়ানা বনাম আধুনা জৌলুসময় ও চাকচিক্য। বনেদিয়ানার আড়ালে যে অহংকার, অবমাননা ও নিষ্ঠুরতা নেই তা তো নয়। এরাও বনেদিয়ানা চালিয়াতি রাখতে গেলে তাদের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়িষ্ণুতার শিকার হয় অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের শিক্ষিত দুই নারী পুরুষ, দুই ভাইবোন বিপ্রদাস ও কুমুদিনী। এরাই উপন্যাসের বিবেক ও আদর্শ। এদের সংগ্রামই যা সমাজের সংগ্রাম, আমাদের শিক্ষার সংগ্রাম। তাকেই ঢাল করে লেখক লড়াই করেছেন। আমরাও রবীন্দ্রনাথের এই সংগ্রামকে সমর্থন করি।

রাজসিকতা মুকুন্দলাল চাটুজ্যে কম করত না। তার স্ত্রী নন্দরানী তা মেপে টেপেই সহ্য করত। এবারের রাস উৎসবটা বাড়ির বাইরে গিয়ে ঠেকল। ইয়ার দোস্তদের উস্কানিতে নদীর বজরাতেও রাখা হল বাঈজী নিয়ে স্ফূর্তি। নন্দরানী এ ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। উৎসবের সব ফুরিয়ে যাওয়ার পরও বজরায় স্ফূর্তির শেষ

হল না। অভিমান করে অবশেষে নন্দরানী বৃন্দাবনে মায়ের কাছে চলে যায়। মুকুন্দলাল ভেবেছিল ক্ষমাটমা চেয়ে যথারীতি নন্দরানীর মান ভাঙাবেন। এসে দেখে ঘর শূন্য। নন্দরানী আর ফিরে আসেনি। মুকুন্দলাল অসুস্থ। মারা যায় নন্দরানীবিহীন। স্বামী সন্তান সবই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। বিপ্রদাস তার মায়ের অভিমানিনী রূপ ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বোধকে উপলব্ধি করে। সম্মান করে। অপরদিকে কুমুদিনী বুঝেছিল তার বাবা মুকুন্দলাল মাকে ভালোবাসত। ভালোবাসাহীন ছিল না তার মা। কুমু বাবার এ বেদনা উপলব্ধি করেছিল। ব্যক্তিত্বকে, রুচিবোধকে বিপ্রদাস ও কুমুদিনী উভয়েই সম্মান করে মান্য করে। তাদের স্বার্থ অপেক্ষা বড় বলে মান্যতা দেয়। এই যে মীরাবাঈ তাঁর স্বামী অপেক্ষা হৃদয়ের দেবতাকে মান্যতা দিয়েছেন, তিনি নেমে এসেছেন পথে এবং পথে। প্রচার করেছেন আত্মমর্যাদাবোধকে। সবকিছু সঁপে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের দেবতাকে। আমরাও দেখেছি কুমু বা কুমুদিনী নিরন্তর বলে গিয়েছেন হৃদয়ের সাড়া পাচ্ছে না। বারবার আওড়ে গেছে মীরার ভজন। এই হৃদয়ের দেবতা অবশ্য কখনও স্পষ্ট করে বলেনি কুমু। কুমু যখন বলছে যখন ফিরে যাচ্ছে মধুসূদনের কাছে। বিপ্রদাসের অবমাননা সত্ত্বেও। বলে, ‘‘তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু মা’র কথা মনে আছে তো? তাঁর তো হয়েছিল ইচ্ছেমৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটব, মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।’’

রবীন্দ্রনাথকে নারীর মর্যাদা ভাবিয়েছে। চতুরঙ্গ-এ দামিনীর একরূপ, চোখের বালিতে বিনোদিনী, নষ্টনীড়-এ চারুলতা আরেক রূপ শেষের কবিতা-য় লাবণ্য ব্যক্তিত্বের একরূপ স্ত্রীর-পত্র-এ তো ভয়ঙ্কররূপে মৃণালের গৃহত্যাগ। জগতে সে একা। সে তাদের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন। যোগাযোগে -এ নন্দরাণীর গৃহত্যাগ।

নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব ‘বেশ জটিল। দ্য সেকেন্ড সেক্স-এর লেখিকার সিমন দ্য বোভয়ার আরো ভয়ঙ্কর রূপে দিয়েছেন। যে কোন - অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। যে কোন অধিকার চেয়ে আন্দোলন করা যায়।কিন্তু এই নারী পুরুষ সম্পর্কের জটিলতা কী ভাবে সমাধান হবে। সেখানে সে একা। একক। যৌথভাবে এ লড়াই করা যায় না। সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিক্ষা ও মানবিক বোধের ওপর। বিবাহিত জীবনই তো শেষ কথা নয়। এর স্বাধীনতা জটিল ও কঠিন। বোভয়া তাঁর নিজের জীবনের ওপর সেই পরীক্ষা করে গেছেন।

।। তিন।।

ঘোষালদের সন্তান, আনন্দ ঘোষালের সন্তান, মধুসূদন পড়াশুনায় ভালো, কলেজের মান রাখতে পারে। অকালে মৃত্যু ঘটে আনন্দ ঘোষালের। মধুসূদনকে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়। শুরু হয় তার ব্যবসা। দ্রুত সে ব্যবসায়ের সফল হয় জমিজমা বাড়িঘর সবই হয় দ্রুত। দ্রুত হয়ে গেলেও, বয়সও থেমে থাকল না। সকলের অনুরোধ বিশেষত মা তার বউ দেখে যেতে চায়। তার মনে জেগে ওঠে সেই ‘মার’। ‘চোখ পাকিয়ে বলে, ঐ চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই।’ ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ংকর।

এদিকে কুমুরা দুই ভাই, পাঁচ বোন, চারবোনের বিয়ে দিয়ে গেছে মুকুন্দলাল। কুমু নিজেকে ভাগ্যবিড়ম্বিতা এবং অপয়া ভাবে। এ ছাড়া বাইরের জগতের মানুষ। বাড়ির ভিতরে পুজো - আর্চায় মানুষ। বড়দা বিপ্রদাস ভিন্ন পংক্তিতে, রুচিতে আভিজাত্যে এক ভদ্র রুচিশীল দর্শনে মানুষ। সুবোধ বিলেতে। ব্যারিস্টারি এবং বৈভবপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত দায়ভার বিপ্রদাসের ওপর। বিপ্রদাসের ভিতর রয়েছে পাশ্চাত্য জীবনবোধ এবং সম্ভ্রমবোধ। এই সম্ভ্রমবোধকে চূর্ণ করার অভিপ্রায় নিয়ে ব্যবসায়ে সফল মধুসূদন যেন নিতে চায় পুরোনো অসম্মানের প্রতিশোধ।

কুমুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় মধুসনের। বিপ্রদাস রাজী নয় কিন্তু কুমু এখানে বিয়ে করবে বলে, ঠিক করে। যেন দৈব নির্দিষ্ট রূপে। একদিকে অর্থের দাম্ভিকতা, অর্থকে হাতিয়ার করে চাটুজ্যেদের টেক্কা দিতে চায় মধুসূদন। বিবাহের সূচনা থেকে চাটুজ্যেদের রীতিনীতিকে অবমাননা করে। ভদ্রতা শিষ্টতা ও শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। চাটুজ্যেদের সকলে ক্ষিপ্ত। এদিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে বিপ্রদাস। ঠান্ডা লাগিয়ে নিউমনিয়া বাঁধিয়ে বসে। ক্রমশ তা বেড়ে ওঠে। তাকে অবশেষে যেতে হয় কলকাতায়। এদিকে কুমুর যে শিক্ষা বিপ্রদাসের কাছে হয়েছিল, সবকিছু কেড়ে নিয়ে ভুলিয়ে দিতে চায়। যা কিছু সম্মানের বলে মনে করে, অস্তিত্ব হিসেবে মনে করে তাকে ঠাট্টা করে বলে ‘নুরনগরী চাল’। এতটুকু বরদাস্ত করতে রাজী নয় মধুসূদন।

একথা হয়তো সাহিত্য পাঠক মানবেন, জীবনের বাস্তব, বা একটি দুটি ঘটনার বাস্তব ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সাহিত্যের বাস্তব হয় জীবনের বাস্তবের চেয়ে অন্যতর, ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বাস্তবের সঙ্গে

আমাদের জীবনের বাস্তবের দ্বন্দ্ব ঘটাতে গিয়ে তিনি বড্ড বেশি মধুসূদন ও কুমুকে গড়েছেন। এক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যে একটু টাল খেয়েছে বলে মনে হতে পারে। মধুসূদনকে বড্ড বেশি ব্যবসায়ে সফল দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার দেখাতে গিয়ে মধুসূদনের এই নীরক্তকরণ আধুনিক সাহিত্যে বাধে বইকী। অপর দিকে মধুসূদনের সব জেনে, বিপ্রদাসের অনীহা সত্ত্বেও, সকল অবমাননা জেনেও বিবাহে সম্মত হওয়া সুযুক্তিপূর্ণ বলে মনে নাও হতে পারে। 'এই নাও হলে পারে' স্তম্ভকে দাঁড় করিয়ে নারীর অবমাননাও নারীর সম্ভ্রম নিয়ে বিতর্কে নেমেছেন। হয়তো অর্থকে ঐ শীর্ষে না তুললে মধুসূদনের ঘৃণিত দাপট সকলকে মানতে বাধ্য করাতে পারতেন না। তা হয়তো বিশ্বাস করানো যেত না। অপরদিকে কুমু মধুসূদনকে বিয়ে করতে রাজী হলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্রদাসকে অবমাননার পরিস্থিতি তৈরি হত না। সাহিত্য ও শিল্প সম্ভবত এ দাবীটা করে। অবশ্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও কুমু ও মধুসূদন দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক্ষেত্রে সিমন দ্য বোভয়ার বক্তব্য আপাতত ঠিক বলেই মনে হয়। দাম্পত্য জীবনের নারী পুরুষ দুজনেই একা। এখানে যৌথতার সুযোগ নেই।

।।চার।।

বিবাহের পর্ব শুরু থেকে সকল সামাজিক নৈতিকতাগুলো যা দীর্ঘ কালীন প্রচলিত বা যেসব অভিজাত আচরণ বলে চলে অসাছে বা ক্ষমতায় থেকে যেসব অলিখিত বিধি করা হয়েছে তা ভেঙে দিচ্ছে মধুসূদন। সব চলবে মধুসূদনের রুচিতে (এ ক্ষেত্রে অশিষ্টতা বলা যায়), অভিরুচিতে। পদে পদে অসম্মানিত করা হতে থাকে চাটুজ্যেদের কৌলন্যকে যা মধুসূদনের কাছে নুরনগরী চাল। বিপ্রদাস ও অনুগত ব্যক্তিরা সব অবমাননা মেনে নেয় কুমুর দিকে তাকিয়ে। কুমুর কথা ভেবে। কোন ভব্যতা মধুসূদনের কাছে গ্রাহ্যের নয়। চূর্ণ করা হচ্ছে আভিজাত্য। স্থাপিত করা হচ্ছে অধুনা বা সাম্প্রতিক জৌলুস। যা দেখে নুরনগরের প্রজাদের চোখে অপার বিস্ময়। তৎসত্ত্বেও জমিদার হিশেবে বিপ্রদাসের ওপরই আস্থা। এতৎসত্ত্বেও আভিজাত্যের দ্যুতি মধুসূদনের ভাই নবীন এবং তার স্ত্রী যাকে সবাই বলে মোতির মা, তাদের চোখে বিপ্রদাস সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এখানে যেন মুক্তির আলো। এরা কখনও মধুসূদনের আশ্রয়ে বা ক্রীতদাসত্বে থাকতে ইচ্ছুক নয়। কুমুর স্থান ওদের কাছে দেবীর মতো। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, কুমুর ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্যে উভয়েই মুগ্ধ। শুধু গাম্ভীর্য ও অর্থের অহংকারী চালে মধুসূদন ওদের মন জয় করতে পারে না। কিন্তু অর্থের দাপটের কছে উভয়ে নত।

উপন্যাসে মধুসূদনের বিপরীত দীপ্তিতে নবীন। যদিও পাঠক ভ্রমে পড়তে বাধ্য, লোকে নবীনকে স্ত্রৈন বলে ভাবে। ধীরে ধীরে নবীনের ব্যক্তিত্ব উন্মোচন ঘটে। সম্পূর্ণভাবে মুক্তকামী মানুষ। মধুসূদনও বুঝতে পারে নবীন আসলে মুক্তপুরুষ। মধুসূদন একটা অবলম্বন খোঁজে। দরিয়ার খড়কুটোর মতো। কুমুর প্রতি আকর্ষণ রয়েচে মুগ্ধতা রয়েছে কিন্তু আভিজাত্যের আলোয় শিক্ষায় আলোতে সে সব বোধ হারায়। অসহনীয় বোধ করে বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে ও চিহ্নমালায়। আর কুমুকে কোনও কিছুতে প্রলোভিত করতে পারে না, কোন শাস্তিও অসম্মান করতে পারে না কারণ বলার আগেই শাস্তি গ্রহণ করে। চাওয়ার আগেই সব দিয়ে দেয়। কিন্তু মধুসূদন ভালোবাসা পায় না। হৃদয়ের সিঞ্চন পায় না পায় না কুমুর হৃদয়ের দ্যুতিগুলি। তার সব জোর রয়েছে। অর্থের প্রলুব্ধ করা বস্তুমালা, দাস দাসী, সে তো মহারাজা, যাকে সবাই রাজা বলে মান্য করে বলে কুমু রানী। কুমুর হৃদয় জুড়ে যে ভাণ্ডার রয়েছে, যে সম্পদ দেহমনে মিশ্রিত, তা হল তার দাদা বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের শিক্ষা, শিক্ষার আলোময়তা, মধুসূদন তা কেড়ে নিতে চায়, ছলে বলে কৌশলে। সব কিছু থেকে রিক্ত করতে চায়। রিক্ত করার লড়াই উপন্যাস জুড়ে। রিক্ততার সম্পদ হলে সম্ভ্রম। দাম্ভিকতা ছেড়ে ধরতে চায় কুমুর দেহকে। মন থেকে সাড়াপায় না। চানঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রস্তুত হয় না। নির্বিকার পাথর সে। বিছানায় না এসে অন্ধকারে ছাদে সে রাত্রি সুখ দুঃখ নিরীক্ষণে মগ্ন। কোন ক্ষোভ, কোন প্রলোভন যখন কুমুকে পর্যুদস্ত করতে পারে না, তখন তার প্রিয় মানুষটির অভ্যেসগুলো ফিরিয়ে দেয়। আশীর্বাদ স্বরূপ যে নীলার অংটিটি দিয়েছিল বিপ্রদাস, যা মধূসদন জোরপূর্বক নিয়ে নিয়েছিল তা ফিরিয়ে দেয়। এর বদলে যে চারটি আংটি দিয়েছিল সেসবের প্রতি এতটুকু মনোযোগী ও লোভী হয়নি কুমু। খুলে দেয় এসরাজ। সে এসরাজ বাজানো শিখেছিল দাদার কাছে। প্রার্থনার মতো করে বাজনা শুনতে চায় মধুসূদন। যেটি দিয়েছিল বিপ্রদাস তাও লুকিয়ে রেখেছিল মধুসূদন সেটিও কুমুকে দেয়। ধীরে ধীরে হৃদয়ের বন্ধ অর্গলগুলো খুলতে সহায়তা করে মধুসূদন।

চারিদিকে মধুসূদন আড়ম্বর করে দেখনদারির একশেষ কর। নায়েব নবগোপাল যখন বিপ্রদাসকে বলে সেসময় সে বলে, নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা—ওটা ইতরের কাজ। —এর ভিতর দিয়ে মুকুন্দলাল ও

মধুসূদন সম্পর্কে বিচার ও অভিমত। অপরদিকে সমাজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে, ধীরে ধীরে তাদের বিচারবোধ ও অভিজ্ঞতায় এক প্রশিক্ষার সৃষ্টি হয়। নব্য উঠতি যাকে সামাজিক ভাষায় উৎসারিত নিন্দিত শব্দ হল ভুঁইফোড়, যা ইংরেজিতে আপস্টার্ট এবং অভিজাত রক্ত যাদের ভেতর উচ্চ সম্মানবোধ, নীলরক্ত বলে পরিচিত ইউরোপে। ‘‘এক রকম জাতিভেদ আছে যে সমাজের নয়, যা রক্তের — সে জাত কিছুতেই ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝাবার সময় পায়নি— কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত করে অনুভব করলে। তা গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে—যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহায় মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে। মোতির মা রেগে উঠে মনে মনে বদলে, দেবতার মুখে ছাই। যে দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েছে সে নাকি উদ্ধার করবে! হায় রে!’’

বিচারবোধ স্পষ্ট। এই নারীবোধে চিন্তায়-পৃথুলতা আমরা দেখি শেষপর্যায়ে। একথা বলা প্রয়োজন বিপ্রদাস কেবল তার বোনের ভিতর শিক্ষা জাতি করেছে। অবশ্য লেখক এ শিক্ষা জারিত করতে চেয়েছেন সমগ্র নারী জগতে।

কুমু যখন শ্বশুর বাড়িতে প্রথমদিকে মূর্ছা যায়, মোতির মা তাকে ভয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে সে উত্তর দেয়—না। কিন্তু মনে মনে আওড়ে চলে, ‘এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।’’ আর গান তো রয়েছে সঙ্গে— মেরা গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।

অজ্ঞান হয়ে যাবার খবর শ্যামাসুন্দরী এসে দেয় মধুসূদনকে। রেগে যায় মধুসূদন। শ্যামাসুন্দরী বলে, নিছে রাগ করছে ঠাকুরপো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে। আজও এই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। আমার প্রতিবেশি শাশুড়ি ছেলের বৌ সম্পর্কে বলতে শুনি, অত ঘন ঘন বউকে বাপের বাড়িতে পাঠাতে নেই। এতে বাপের বাড়ির মায়া কাটতে দেরী হবে, পোষ মানানে দেরী লাগবে। মহিলার বিদ্যে প্রাথমিক স্কুলও নয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ তার অপাঠ্য। ওর মুখে একথা শুনে মনে হয়েছিল, বড়ো ‘বিস্ময়। মেয়েরা মেয়েদের পোষা জন্তু ভাবে। —পরবর্তীকালে এই শ্যামসুন্দরীর নারীসত্তা জেগে উঠতে দেখি যখন কুমু দীর্ঘদিন বিপ্রদাসের কাছে। যে যাবে না মধুসূদনের কাছে। সে সময় শ্যামসুন্দরী ভেবেছিল মধুসূদনকে করায়ত্ত করে বাড়ির অন্দরের সব কর্তৃত্ব নেবে। কিন্তু মধূসূদন শুধু শরীরই চায় তার আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা পায় না। রাতে মধুসূদন শ্যামাসুন্দরীকে ডেকে পাঠায়। সে মধুসূদনের ঘরে যায় বটে। তবে মধুসূদনের লালায়িত আকাঙ্ক্ষার সামনে নারী সত্তাকে বিলিয়ে দেয় না। তার কাছে নারীর সম্ভ্রমই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। রাজদম্ভ সেখানে পরাজয় মানে। প্রণয় ইচ্ছে থাকলে তার সম্ভ্রম অধিকার বর্জন করে না। নারীর অন্তঃপুরে শ্যামাসুন্দরীর অবশ্যই প্রয়োজন। এখানেও পরাজয় মানতে হয় মধূসূদনকে।

কুমু ঘরে - ঢুকতেই মধুসূদন বলে উঠল, ‘‘বাপের বাড়ি থেকে মুর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চলতি নেই। তোমাদের ঐ নুরনগরি চাল ছাড়তে হবে।’’ —কুমু চুপ করে থাকে। মধুসূদন এতে আরো রেগে যায়। একে বাজিয়ে দেখার জন্য আরো তীব্রভাবে বলে। তোমার খেদমতগারি করার ফুরসত নেই। মধুসদূন দেখে মেয়েটি ঝগড়াও করে না। ‘‘তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি, আমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারি।’’

কুমু একথার প্রত্যুত্তরে বলে, দু কথার উত্তর হিশেবে, ধীরে ধীরে ‘এক-তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মানের মধ্যে নেব না।

দুই—দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোটো হোয়ো না।

এসব শুনে মধুসূদন কর্কশভাবে বলে, কী! আমি ছোটো। আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো?

কুমু বলে, ‘‘তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার ঘরে এসেছি।’’ মধুসূদন ব্যঙ্গ করে বলে, জেনেই এসেছ, না টাকার লোভে।

কুমু সোফা থেকে বাইরের খোলা ছাদের ওপর মেঝেতে গিয়ে বসে। কুমুর ঐ শিক্ষা হয়েছে পুরুষের কাছে স্ত্রী হল দাসী। যারা এ মানে বা মানায় তারা কী জাতের লোক, সে দেখেছে এ বাড়িতে নিজের বলে কিছু নেই। নিজের স্বাধীনতাটুকু তা আছে কী। সে কী নিথর বস্তু একটা দেহ মাত্র। সে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। কুমু সবসময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। সকল ত্যাগের ভিতর দিয়ে তার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। মধুসূদন চায় বিপ্রদাসকে সম্পূর্ণভবে ত্যাগ করুক। তার অস্তিত্ব একটুকু যে কুমুর ভিতর না থাকে যখন কুমু নিজের হয়ে আসবে সেভাবে আসুক এতটুকু জোর করবে না। বিপ্রদাসের দেওয়া চাদরটা খুলিয়ে নেয় মধুসূদন

কুমুর শরীর থেকে। সোফার ওপর বসে বলে, এইখানে বসে রইলুম, যদি আমায় ডাক তবেই যাব। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

কুমু কী করবে। নিস্তব্ধ ঘর। ভাবে এ কী পরীক্ষায় ফেলল তাকে। বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে বলে, "আমাকে অপরাধিনী কোরো না।"

মধুসূদন গভীর কণ্ঠে বলে, "কী চাও বলো, কী করতে হবে?"

কুমু বলে, শুতে এসো।

কথা কী ফুরোল নটে গাছটি মুড়োল। না আদৌ তা নয়। দুজনের দূরত্বই বেড়ে গেল। নারীর সম্ভ্রম কী এত সহজে পুরুষ দেয়। এতদিন যে অবাধ হুকুম দেবার অধিকার, এতদিন শ্রমে তেজারতি ব্যবসার সাফল্যের ফলে জোর করে সম্মানিত হওয়া, তার বিকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া মন, তা এত সহজে বিলীন করে দেবে। তবে থাকে কী।

মজাটা এই মোতির মা অর্থাৎ নবীনের স্ত্রীর ভিতর স্ববিরোধী রূপ বড় বিচিত্র। ওর ভিতর রয়েছে এক সহমর্মিতা কিন্তু তা সম্পূর্ণ চিরাচরিত পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত, নারীরা পুরুষের স্বভাবের অবিবেচকতাগুলো মেনে নেয়, মেনে নেওয়াটা উচিত বলে অপরকে মান্য করতে বলে। এখানে দুটো উদারহণ দিলে ঠিক হবে— (১) "ঈর্ষা — যেহেতু নিজে ইংরেজি পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু উনি স্বামী - জাতের, এড়ু কেশনের বিরোধী। আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্ছে, ওর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হওয়াতে ওর আক্রোশ।" —একথা নবীনের। বিপ্রদাসকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু অন্য সবাই তার শিক্ষার অধীনে থাকুক।

মোতির মা যখন কুমুকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বলে এবং যুক্তি দেখিয়ে বলে, এর আগে অবশ্য ওদের অভিজ্ঞতা এই মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামাসুন্দরীর অবৈধতা ফলত মোতির মা চায় কুমু তার অধিকার ছাড়বে কেন। সে তার স্বামীকে আঁকড়ে ধরুক। আপন সংসারে না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না; পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।

"স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারও নেই, চক্রবর্তী - সম্রাটেরও না।"

মোতির মা কিন্তু একে ঠিক মেনে নিতে পারে না। কোনো মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাড়িয়ে যাবে এ তার ঠিক মনে হয় না। সংসার স্বামীর সঙ্গে, ঝগড়াঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর - অপমান না - হয় যথেষ্ট ঘটল, এমন-কি, তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আত্মহত্যা তাও ঠিক, কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে এটা তার কাছে স্পর্ধা বলে মনে করে। মেয়ে জাতের এত গুমোর কেন? মধুসূদন, যত অযোগ্য হোক যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষ মানুষ, এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা করে জিতবে কে?

বিপ্রদাস বুঝতে পারে মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এই জন্য মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিভিয়ে বসে আছে। তারপরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্ব্বোচ্চ চরিতার্থতা। না—মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্ছে।

মানুষ মানুষকে সম্মান করবে।

কুমু যখন তার দাদা বিপ্রদাসকে প্রশ্ন করে, স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে।

বিপ্রদাসের উত্তর— অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকে দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না।

যদি করে— কুমুর জিজ্ঞাসা। তারই উত্তরে বিপ্রদাস জানায় "স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।"

অধৈর্য হয়ে মোতির মা বলে, "আমাদের বউরানী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওকে স্পর্শ করতেও পারে না।"

বিপ্রদাস উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, "তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবছ। আর যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান করবার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্ছে তার দুর্গতির কথা ভাবছ না কেন?'

।। পাঁচ।।

সব উপন্যাস শুরু হয়, তার শেষ হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপন্যাস 'যোগযোগ' শেষ করেছেন। 'আমরাও' যোগাযোগ' পাঠ শেষ করলাম। কুশীলবরা, বিশেষ করে প্রধান চরিত্ররা তাদের যে আবর্তনে রাখা হয়েছে তদের সঙ্কট থেকে মুক্ত হল কীভাবে। আদৌ কি তাদের সঙ্কট সমাধান হল। উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে বিপ্রদাস, কুমু, মধুসূদন এবং তাদের ঘিরে আরো তিনটি চরিত্র আবর্তিত হয়েছে তারা হল নবীন, নবীনের স্ত্রী এবং শ্যামাসুন্দরী। বাকি চরিত্রের আসা-যাওয়া মূলত ওদের সঙ্কটগুলোকে স্পষ্ট করার জন্য।

কুমুর কি জয় হল বা কুমু যে-ভাবে মধুসূদনের কাছে ফিরে গেল বা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে লেখকই পরাজয় মানলেন। লেখকও হাতের ফুতুল সাহিত্য ও শিল্পের কাছে। কলমের খোঁচায় সব সমাধান করে দিতে পারেন না। তাঁকে অবশ্যই মানতে হয় সাহিত্যের বাস্তবতা। লেখক সব সময় সাহিত্যের নিগড়ে বাঁধা। এক্ষেত্রে লেখক কুমুর মার ইতিহাস বা নিয়তি জানিয়ে রেখেছিলেন যা কুমু তার জীবনের নিরীক্ষা হিশেবে গ্রহণ করেছে।

কুমু যখন অসুস্থ বিপ্রদাসকে দেখতে আসে, সে মধুসূদনের অশোভনতা মেনে নেয়নি। সে যখন মুরলী বেয়ারার শীতের কষ্ট দেখে একটা নিজের আলোয়ান দিতে চাইল। এতে মধুসূদন নিজে আলোয়নটি পরে মুরলি বেয়ারাকে ডেকে একশো টাকা বখশিস হিশেবে দেয়। বলে মাঝি তাকে দিয়েছে। এরা কোন জিনিস সহানুভূতিশীল মনে দিতে পারে না। পারে না মর্যাদাকে বড়ো করে দেখতে। কুমু বুঝেছে এ সংসারে নিজের কিছু নেই। সবই তাদের মতো গড়ে উঠতে হবে। তাদের সকল মানসম্মান পদতলে রেখে ওদের গড়া পুতুলের মতো চলতে হবে।

বিপ্রদাসের কাছে এসেছে নিজের টানে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়—কুমু ফিরে যেতে পারে না। সেখানে সম্ভ্রম নষ্ট হয়। মধুসূদন তাকে নিতে এসে ফিরে যায়। কুমুকে বলে, আইনের সাহায্যে পুলিশ দিয়ে তাকে নিয়ে যাবে। এতে কুমুকে টলানো যায় না।

এসময় মোতির মা ও ক্ষেমাপিসির বিচারে জানতে পারে কুমু সন্তানসম্ভবা। দাই ডাকিয়ে নিশ্চিত হয়। ব্যাপারটা বিপ্রদাসের কানে যায়। কানে যায় মধুসূদনেরও। কুমু ফিরে যাবে মধুসূদনের বাড়িতে, নিতে আসে মধুসূদনের বাড়ি থেকে। এই সন্তানের অধিকার রয়েছে ঘোষালদের, ঘোষাল বংশের এবং মধুসূদনের।

সন্তানই কী দাম্পত্য জীবনের সমস্যার একমাত্র নিরসন। না সে তো নন্দরানীর দৃষ্টান্তই রয়েছে। মীরাবাঈ ও কুমুর অন্তরের সাড়াই উপন্যাসের থিম হয়ে রয়েছে। লেখক একেই শেষ সিদ্ধান্ত বা দর্শন বলেই আমাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নারীর সম্ভ্রমই শেষ কথা।

কুমু বিপ্রদাসকে জিজ্ঞেস করে, ''তবে কি যেতে হবে দাদা?''

'তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন স্পর্ধায়?'

কুমু বলে, 'আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও ওদের পারব না সুখী করতে।...সমাজের কাছে থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব..."

কুমু চলে যায়। যাবার আগে বিপ্রদাসকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেয় সে কখনও যেন তাকে না দেখতে যায়। এই তাদের শেষ দেখা। নিঃসঙ্গ হয়ে রইল বিপ্রদাস।

কালু এসেছে বৈষয়িক কথাবার্তা বলতে, বিপ্রদাস সেসব নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। কালু জিজ্ঞেস করে, ''বাইরের দিকে ঐ জানালাটা বন্ধ করে দেব কি? রোদ্দুর আসছে। বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানায় দরকার নেই।

''কালু তবু রইল বসে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই, এ শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুনতে পেলে বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চলে যেতে দেখেছে, কী একটা বুঝেছে, ভালো করে বোঝাতে পারছে না।' এভাবে শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাঠক যা বোঝার বুঝে নেবেন।

উপন্যাসে বিপ্রদাসের জয়ও যেমন হয়নি তেমন তার পরাজয়ও ঘটেনি। শোভনতার হার কখনও শিল্পে সাহিত্যে হয় না। আশি বছর পরে বাঙালি কতটুকু এগিয়েছে তা একমাত্র পাঠকই বিচার করবেন।